IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

সংস্কৃতির বিশেষ দিকচিহ্নের নিদর্শন 'লোকনেশা': সমাজে ও সাহিত্যে

কার্ত্তিক বর্মন
গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Received (revised form) NA
Accepted
Paper_Id: **ibjcal2019SD02**

Keywords:

লোকনেশা
সাহিত্যে লোকনেশা
সমাজে লোকনেশা
লোকনেশা: সমাজে ও সাহিত্যে
সংস্কৃতির নিদর্শন লোকনেশা

ABSTRACT

'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো / বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো ' -এমন কোন বাঙালি শিশু নেই যার সাথে ছড়াটির পরিচয় নেই। শৈশবে বেশ মজার শুনাতো। কিন্তু বড় হয়ে ভ্রু-কুঁচকে ভাবা গেল এটি একটি নেশার পরিচয়বাহী। নিয়মিত পান না খেলে মেজাজ ঠিক থাকেনা এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বহুল। একে লোকসমাজ স্বীকৃতি দিয়েছে লোকনেশা রূপে। লোকনেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ শিথিল। ফলে গ্রহণের তাগিদ আবালবৃদ্ধবণিতা সবার মধ্যে। পূজা-পার্বণে কোন গুলো আবার 'প্রসাদ তুল্য'। কৃষিনির্ভর লোকসমাজে কষ্ট লাঘবের জন্য কিংবা মানসিক স্বস্তির জন্য লোকনেশা সেবন করেন। আধুনিক প্যাশান কিংবা 'ঠেলার চাপে' সেই সকল সহজলভ্য নেশার উপকরণ গুলো বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। লোকসংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী বিষয় স্মৃতিবাহী হয়ে বাঁচার উপকরণে পরিণত হতে চলেছে, যা 'হয়তো' একেবারেই কাম্য নয়।

আধুনিক যুগে সভ্য সমাজে নেশা সেবন এক গর্হিত কাজ। কিন্তু লোকসমাজে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেশা গ্রহণ 'পূজার প্রসাদ' তুল্য। তাই বলা যেতে পারে, ব্যক্তি কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতি ভেদে তার মাত্রা ভিন্নতর। আমরা স্বল্প পরিসরে জানতে সচেষ্ট হয়েছি, নেশা গ্রহণের তাগিদ কেন লোকসমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিল? উপাদান বা উপকরণ কি কি? সেবনের পদ্ধতি কেমন? কারা এই নেশা সেবন করেন? এর উপাদান গুলো বর্তমান সময়ে একই রকমভাবে প্রচলিত আছে কি? বাংলা সাহিত্যে লোকনেশার উল্লেখ কোথায় মিলে - সে বিষয়েও কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

নির্দিষ্ট সময় হলে নির্দিষ্ট সিরিয়াল দেখতেই হবে। অধীর আগ্রহে বসে পড়ে টিভির সামনে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: পকেট থেকে বের করে একটু দেখে নিয়ে রেখে দিল। সংকেত ছিল না, তবু দেখতে থাকে মাঝে-মধ্যে। বোধহয় কিছু সংকেত এসেছে। এরকম হামেশাই ঘটে মোবাইলে আসক্ত মানুষটির সঙ্গে। এ তো গেল অতি আধুনিক যুগের 'নেশা'-র উদাহরণ। 'নেশা' বলব না কেন? কেবল চর্ব- চুষ্য-লেহ্য-পেয় মাধ্যম ছাড়া কী নেশা হতে পারে না। যার প্রতি প্রয়োজনের থেকে তীব্র আকর্ষণবোধ জন্মায় তাকেই তো নেশা বলা যায়। আমরা অবশ্য বলতে পারি, এ মানসিক

নেশার অন্তর্গত। মনকে সম্পূর্নভাবে বিদ্ধ করে এর কার্যাবলী। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবল মানসিক নয় শারীরিক দিককেও প্রভাবিত করা – এমন সামগ্রী নিয়ে, যা লোকসমাজে 'লোকনেশা' নামে স্বীকৃত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শাখা লোকসংস্কৃতি। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলো লোকসংস্কৃতি। লোকসমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে এবং লোকসমাজের জীবনচর্চার সামগ্রিক রূপটি প্রকাশিত হয় লোকসংস্কৃতিতে। "লোক' বলতে কোনও একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝায় এমন একদল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডে তারা বসবাস করে, তাদের আর্থিক কাঠামো একইরকম, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরনের বিশ্বাস – সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।" (১)

দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন লোকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। কৃষিকাজ এদের মূল ভিত্তি। কৃষিজ ফসল ভালো হোক, সংসারে সমৃদ্ধি আসুক-এজন্য এরা মানত করে, ব্রত-উপবাস রাখে। দেব-দেবীর তুষ্টির জন্য নানান পূজা-অর্চনার আয়োজন করে। পুজোর সময় হাঁড়িয়া, ভাঙ, গাঁজা, সিদ্ধি জাতীয় দ্রব্য সেবন করে। এগুলোকে তারা প্রসাদের মর্যাদা দেয়। অথচ পূজা-অর্চনা ভিন্ন যখন 'লোক' ঐ সকল সামগ্রী অথবা অন্যান্য শারীরিক অস্থিরতা সৃষ্টিকারী দ্রব্য সেবন করে তখন তাকে বলে 'লোকনেশা'।

লোকসমাজের মানুষ যে সকল দ্রব্য নেশার কাজে ব্যবহার করে অথবা লোকসমাজ দ্বারা নেশার বস্তু রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেইসব সামগ্রীকে লোকনেশার উপাদান বলা চলে। লোকনেশা বলতে, ঐ সকল উপাদানের নিয়মিত সেবনকে বোঝায়।

লোকনেশা গ্রহণের তাগিদ মানুষের মধ্যে কীভাবে এল? কোথায় লুকিয়ে এর উৎস? এ সমস্ত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। তবে বলা যেতে পারে, 'সভ্যতার আদিকালে মানুষ যখন বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্যের জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো তখন তারা যা পেতো তাই খেতো। কোন খাবার ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কোনটা খারাপ। কিছু খাবার খেয়ে ঝিমুনি ভাব, অস্বস্তি, ঘুমিয়ে থাকা, পাগলামো করা ইত্যাদি অনুভবের বিষয় থেকে এসেছে নেশাগুলি'। (২)

এবার জেনে নেব কিছু লোকনেশার বিষয়ে। দু'ঠোটের ফাঁকে ঢুকিয়ে খুব আমেজ করে সুখ টান দিয়ে যে নেশা সেবন করা হয়, তার নাম বিড়ি। তামাক পাতাকে ভালো করে 'মশলা' (শুকো) দিয়ে মুড়ে সুতোর সাহায্যে বেঁধে বানানো হয় বিড়ি। অনেকে শুকোর পরিবর্তে মৌরী ব্যবহার করে মৌরী বিড়ি বানায়। কাশি থেকে মুক্তি পেতে কেউ আবার বাসক পাতা মশলা হিসেবে কাজে লাগায়। অনেকে শোলা পুড়িয়ে বিড়ির মতো টান দেয়। এক সময় বনেদীয়ানার পরিচয় বহন করত হুঁকো। এখন যার স্থান যাদুঘরে। বিড়ি বা সিগারেট প্রচলনের পর কদর হারিয়ে ফেলেছে হুঁকো। তামাক পাতাকে ফেঁটে চিটেগুড় মিশিয়ে কলকেয় সাজিয়ে হুঁকোতে লাগিয়ে জল ভরে টান দিতে হয়। গাঁজা গাছের পাতা স্যাঁতানো ঘরে রেখে প্রাথমিক রূপ দেওয়া হয়। এরপর শুকোর সঙ্গে দলে কল্কেতে ভরে আগুন ধরিয়ে হাতের তালুতে কায়দা করে ধরে জোরে জোরে মুখ দিয়ে টান দিতে হয় গাঁজা সেবনের জন্য।

মতিহার গাছের পাতা বিশেষতঃ পাহাড়ী অঞ্চলের মতিহারের বেশ সুনাম রয়েছে নেশার উপকরণ হিসেবে। গাছ থেকে পরিণত পাতা তুলে স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে কয়েকদিন রেখে দিতে হয়। তারপর কেটে কুচি কুচি করে উপযোগী কৌটোতে ভরা হয়। প্রয়োজনমত আঙুলের টিপে তুলে চুন দিয়ে ভালো করে হাতের তালু ও আঙুলের (বৃদ্ধাঙ্গুল)

সাহায্যে দলে ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের গোড়ায় ভরে চুষে চুষে নেশা করা হয়। দক্তার ক্ষেত্রেও খানিকটা আগের পদ্ধতি মানা হয়। ভাজাদক্তার ক্ষেত্রে ধনে ও মৌরী ভেজে মেশানো হয়। পানের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া হয় ভাজাদক্তা।

পুজোয় বাবার প্রসাদ রূপে সিদ্ধি বা ভাঙ পান করে অনেকে। ভাঙপাতা বাটা, সজনে গাছের শেকড় বাটা, দুধ, কলা, বাতাসা ও ডাবের জল মিশিয়ে অত্যন্ত সুস্বাদু উপাদেয় করে তোলা হয়। ভাঙ বা সিদ্ধি পানের কয়েক ঘণ্টা পর প্রচন্ড নেশা ধরায়। নেশার ঘোরে ভুল বকতে থাকে। অনেকে কাঁচা ভাঙের পাতা বড়ার মতো ভেজে খায়। মহুয়া ফুলের রস স্বাদে অত্যন্ত মধুর। প্রচন্ড নেশা ধরায়। নারী পুরুষ উভয়েই পান করে। বাসি ভাত বেশ কিছুদিন হাঁড়িতে রেখে পচানো হয়। তারপর ছেঁকে পরিষ্কার করা হয়। কাঁচালঙ্কা কিংবা আলুসেদ্ধ চাঁট হিসেবে টাকনা দিয়ে পান করে। খেজুর বা তালগাছের রস বাসি হলে তাকে তাড়ি বলে। বেশী পরিমাণে পান করলে ভালোই নেশা ধরায়। তাড়ির সাথে বাবলা ছাল ডুবিয়ে তিক্ত কষা স্বাদ নিয়ে আসে, যা নেশার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

নাক দিয়ে সেব্য এক প্রকার গুঁড়ো নেশার দ্রব্য নস্যি। তীব্র ঝাঁঝালো। সেবনের সাথে সাথে চোখে জল গড়িয়ে আসে। পোস্ত গাছ থেকে পাওয়া যায় আফিম। বঙ্কিমের কমলাকান্ত আফিমের ভক্ত ছিল তা আমরা 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে জানতে পারি।

নেশা সেবনের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষ এ বিষয়ে সচেতন। তবে নেশাসেবনকারীরা এর কিছু কার্যকরী দিক তুলে ধরে। কাজে উদ্যম মেলে। ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে তোলে। মেজাজ ফুরফুরে রাখা যায়। হতাশা চাপা যায়। বেদনাদায়ক স্মৃতি সাময়িক ভুলিয়ে রাখে। ক্লান্তি দূর করে। ঘুম পাড়াতেও সাহায্য করে। ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সহায়ক। শরীরকে ঋতুর উপযোগী রাখতেও পারে নেশার সামগ্রী।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম নেশার সন্ধান পাওয়া যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত আদিতম নিদর্শনরূপে সর্বজনবিদিত 'চর্যাপদ'-এ, -

"মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী" (৩)

অর্থাৎ মহারস (মদ) পানে সে (চিত্ত) মাতাল হলো, ত্রিভুবন সমস্তই উপেক্ষিত হলো।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'বন্ধ্যাযুগ' বা 'অন্ধকারময় যুগ' পরবর্তী গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। আদি-মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন রূপে যা স্বীকৃত। এই গ্রন্থেও পাই নেশার সন্ধান। কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে পাঠিয়েছেন তাম্বুল অর্থাৎ পান, -

"... বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী।
... ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।" (৪)

নেশার প্রসঙ্গ বার বার এসেছে লোকসাহিত্যে। সাহিত্য শাখার মৌখিক ধারাটি হলো মূলতঃ লোকসাহিত্য। কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংহত গ্রামীণ সমাজ তথা লোকসমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে লোকসাহিত্যেরও জন্ম হয়েছিল। এর প্রধান বিভাগ হলো ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ।

ছড়া এমন এক লোকায়ত সাহিত্য যা মুখে মুখেই রচিত হয়েছে। ছোট বা মাঝারি পদ্যের আকারে, যার বিষয়ের মধ্যে অসংলগ্ন কল্পনার প্রয়োগ আছে এবং যা অন্তরমিলযুক্ত ছন্দবদ্ধ রচনা, যাতে চিরায়ত শিশু মনস্তত্ত্বের ওপর নানাভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, এবং কিছুটা পরিবর্তনসহ চিরকাল বেঁচে আছে। এমনই এক চিরপরিচিত ছড়া, -

"ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।" – (৫)

মাসি-পিসি তথা অতিথিদের সেবায় পান খেতে দিতে চেয়েছে। পান খেতে দেবার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করলে মনে হতে পারে কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষার তাগিদ। আসলে কিছু সুবিধে রয়েছে পান খাওয়ার। মুখে রুচি আনে, হজমে সাহায্য করে, বদ্‌হজম প্রতিরোধও করতে পারে। তাই বাড়ির প্রবীন থেকে নবীন – সবাইকে পান খেতে দেখা যায়।

ছড়ার পরে লোকসাহিত্যের অপর জনপ্রিয় শাখা ধাঁধাঁ। সমাজ অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকেই ধাঁধাঁর জন্ম। এটি বুদ্ধিপ্রধান লোকসাহিত্য। যেখানে রূপকের আড়ালে থাকা প্রশ্ন বা প্রশ্নমালা, যা প্রতিপক্ষের দিকে উচ্চারিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দ্বারা বিশ্লেষিত নির্দিষ্ট উত্তর বা উত্তরমালা কামনা করা হয়। ধাঁধাঁর মধ্যেও মেলে নেশা প্রসঙ্গ,-

'হাটে বিকাই, বাটে বিকাই,
ভাত পচিয়ে নিজে খাই।' (৬)

হাঁড়িয়া পান বিষয়ক এই ধাঁধাঁ। উল্লেখ্য আদিবাসী সমাজে জনপ্রিয় এই পানীয়টি।
এককভাবে যেমন নেশা গ্রহণ করে, আবার দল বেঁধেও খেতে দেখা যায়, -

'পুকুরের মধ্যে তাল গাছ, ব্রহ্মায় করেছেন বাসা,
কেউ খাচ্ছেন, কেউ নিয়েছেন, কেউ করছেন আশা।'– (৭)[হুঁকো পান]

আরও পাওয়া যায়,-

'খাচ্ছ নিজে, দিচ্ছ মোকে
তবু কেন মরছি ভোকে?' (৮)[বিড়ি পান]

লোকসাহিত্য প্রয়োগমূলক ধারার সঙ্গে বেশী করে যুক্ত রয়েছে প্রবাদে। প্রবাদ হিসাবে যে রচনা মান্য হয়ে উঠেছে তার মূলে আছে জীবনধর্মী তথ্যের সমণ্বয়। মানব মনে আপনি জন্ম নেওয়া, মানব মুখে আপনি প্রচলিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সরস অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির সহজ, সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তিময় ভাষারূপ, যা লঘু বাক্‌সূত্রের চাতুর্যে বদ্ধ এবং স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বাস্য ও দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন প্রাপ্ত এই প্রবাদ। প্রবাদ আমাদের নেশার বিষয়ে এমন এক কথা জানান দেয় যা অবিশ্বাস্য। ভাবতে অবাক লাগে যে একটি স্থানের পরিচয় গড়ে উঠতে পারে নেশার নিরিখে! -

'মুখে পান হাতে চুন
তবে জানবে মানভূম।' (৯)

মানভূমের অধিবাসী যে প্রচুর পরিমাণে পান খেতেন এর থেকে বোঝা যায়।

শুরুতে হয়তো মানুষ না বুঝে নেশা হয়েছে। কিন্তু যতদিন পার হয়ে চলেছে সচেতন ভাবেই এর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। নেশা সেবনের ক্ষেত্রে লোকসমাজে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। তাইতো দেখা গেছে, ক্ষুধার জ্বালায় শিশু অস্থির হয়ে পড়লে মুখে হাঁড়িয়া বা মহুয়া ঢেলে দিত আদিবাসী মহিলারা। অসহায় শিশু নেশায় ঢলে পড়ত। কান্নাও যেতে থেমে। পুরুষ-মহিলা উভয়েই নেশা গ্রহণ করে। ধর্মও কোন বাধা নয়। হিন্দু-অহিন্দু সর্ব ধর্মের মানুষ, ধনী–নির্ধন ও একসাথে চিবিয়ে, গিলে, চুষে, নাক দিয়ে শুঁকে – নানা উপায়ে নেশা সেবন করে। বলতে ইচ্ছে হয়, নেশা গ্রহণকারীর কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। তাদের একটাই ধর্ম তারা 'নেশাখোর।'

সহজ প্রাপ্য ও তুলনামূলক সস্তা নেশার উপকরণগুলো আদরের সঙ্গে গৃহীত হত লোকসমাজে। বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। মাটির বাড়ি ধীরে ধীরে সরকারী প্রকল্পের সাহায্যে হয়ে উঠছে পাকা, পথ-ঘাটও ঢালাই। ক্রমশঃ শহর তার থাবা বিস্তার করেছে গ্রামে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদের সাথে খাদ্যরুচিও বদলাচ্ছে। ফলে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেশার ধরণও পালটাচ্ছে। গুটখা, খৈনী, ঠান্ডা বা গরম পানীয় সহ আরও দামী নেশার সামগ্রী লোকসমাজে অনুপ্রবেশ করছে। স্বাভাবিক কারনেই লোকনেশার উপকরণ তার জৌলুস হারাচ্ছে। হুকো নিজের দিন ফুরিয়ে বসে আছে। ঐতিহ্য পরম্পরায় যে লোকনেশার প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ন বিলুপ্ত না হলেও ক্রমশ সেই পথে এগুচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র

১। মজুমদার মানস, ‘লোকসংস্কৃতি : সংজ্ঞা, স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ,’(সম্পা) সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, ‘প্রবন্ধ সঞ্চয়ন’, দ্বিতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, ২০০৯, পৃষ্ঠা–১৭

২। মল্লিক সুব্রত, ‘লোকনেশা’, (সম্পা) বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ‘বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ’, দ্বিতীয় সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৫০৩

৩। দাশ নির্মল, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, দ্বাদশ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৬৪

৪। (সম্পা)ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, ‘বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, ষোড়শ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃষ্ঠা-২০৯

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘লোকসাহিত্য’, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃষ্ঠা – ৫৫

৬। মণ্ডল সুমিতা, ‘ধাঁধাঁয় নেশা প্রসঙ্গ’, (সম্পা)বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ‘ধাঁধাঁ : স্বরূপ সন্ধান’, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১৩৯

৭। মণ্ডল সুমিতা, ‘ধাঁধাঁয় নেশা প্রসঙ্গ’, (সম্পা)বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ‘ধাঁধাঁ : স্বরূপ সন্ধান’, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১৪০

৮। মণ্ডল সুমিতা, ‘ধাঁধাঁয় নেশা প্রসঙ্গ’, (সম্পা)বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ‘ধাঁধাঁ: স্বরূপ সন্ধান’, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১৩৯

৯। বসাক সুদেষ্ণা, ‘বাংলার প্রবাদ’, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১০১